The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXV, No. 1, pp 39-56, ISSN 2306-3920

বাংলাদেশের চিত্রকলা : প্রসঙ্গ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারা

এম. এম. ময়েজউদ্দীন*

[**সার-সংক্ষেপ :** বাংলার চিত্রকলা প্রাচ্য ধারায়ই সুদীর্ঘকাল চলে আসছিল ব্রিটিশ শাসনের ঔপনিবেশিক প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার পরিবেশ ও অন্যান্য বাস্তবতা আরোপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। অজন্তার চিত্ররীতি এ দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিত্রকলার চর্চায় দুর্লভ নয়। সেই সঙ্গে লোকায়ত কিছু উপাদান, অনুষঙ্গ ও শৈলীকে তা গ্রহণ করেছিল। মুসলিম সংস্কৃতিকে, বিশেষত পারস্য সংস্কৃতিকে যদি প্রাচ্য ধারার সংস্কৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে এবং দূরপ্রাচ্যের দেশ চীন ও জাপানের চিত্রকলার চর্চার রীতিপদ্ধতিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে ইতিহাসের বিরাট কালপর্ব জুড়ে দেখতে পাওয়া যায় এ দেশের চিত্রকলা একান্তই বিকাশ লাভ করেছে পরিপ্রেক্ষিতযুক্ত এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামান্য লক্ষণকে আয়ত্ত করে। ঔপনিবেশিক কালপর্বের বিরাট ধাক্কায় এককালে আবার সে সমস্তই চিত্রাদর্শ হিসেবে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তবে শীঘ্রই এই অভিঘাতকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে প্রাচ্যকলার পুনর্জাগরণ ঘটে এবং স্বাধীনতার পূর্বাপর বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের তা প্রভাবিত করে। কিন্তু প্রাচ্য ধারার শিল্পচিন্তার পাশাপাশি আধুনিক মননের ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যুগোপযোগী পাশ্চাত্য চেতনার চিত্রবিদ্যা ও নন্দনতাত্ত্বিক ধারার চিত্রকলাও অপরিহার্য ও অপ্রতিহত প্রভাব রাখে। ফলে বাংলাদেশের চিত্রকলায় দুটি স্পষ্ট প্রবাহ সমান্তরালে চলমান থাকে। বাংলাদেশের চিত্রসাধনার আলোচনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এ দুই ধরনের চিত্রবোধ ও আদর্শের দিক থেকেই বিবেচ্য হওয়ার দাবি রাখে। কখনো কখনো এ দুই ধারার মধ্যে সমন্বয় ঘটে আবার কখনো কখনো পরস্পর পরস্পরের থেকে দূরবর্তী প্রবাহ নিয়ে বয়ে যেতে থাকে। একটিকে ছাড়া আরেকটি তা না হলে অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়; যেহেতু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলা এ দেশের চিত্রকলাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

ভূমিকা

মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত, পাল আমলে সামগ্রিকভাবে চিত্রকলার শৈলী ও চিত্রবিষয়ের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে, দেখা যাচ্ছে এক ইংরেজ আমলেই তার থেকে ভারতীয় চিত্রধারা এক ধাক্কায় এর ঐতিহ্য থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। সমাজের সকলেই শিল্পচর্চায় ব্যাপৃত হয় না; সকল শ্রেণিই একই রুচির কাঠামোতে আবদ্ধ থাকে না। বাংলা অঞ্চলের চিত্রসাধনা তথা ভারতবর্ষের চিত্রকলার প্রবণতা একটি বড় যুগপরিসরের মধ্যে দার্শনিক বিচারে বাস্তববাদী হলেও বস্তুবাদী ছিল না; বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে, ঔপনিবেশিক আমলের শুরুর দিকে, মুর্শিদাবাদ চিত্ররীতি, যা মুঘল আমলের চিত্ররীতির শিল্পীদেরই এক পতনশীলতাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ইংরেজ আমলের শুরুর দিককার বস্তুবাদী ঘরানা। হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের হাত ধরে বেঙ্গল স্কুলের নব্যবঙ্গীয় ধারা শীঘ্রই প্রাচ্যচিত্রের চিত্রাদর্শ ও মাধ্যমকে আত্মস্থ করে; যেখানে ধৌত জলরঙের

* **এম. এম. ময়েজউদ্দীন : সহযোগী** অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ছবির মহিমা উন্নীত হয় চৈনিক-জাপানি ইত্যাদি এশীয় পদ্ধতিকে আয়ত্ত করে নিয়ে। ওকাকুরা, আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ-উদ্দীপনায় দেশজতার বিকাশে এই চিত্রচর্চার পদ্ধতি দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করে। আধুনিকতার সঙ্গে ভারতীয় ধারার চিত্রবোধের সংশ্লেষণের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই চিত্রবোধ শুধু বিষয়কেই নির্দেশ করে না, এর সঙ্গে যুক্ত হয় চিত্রাঙ্কনেরও দেশীয় পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিকীকরণের প্রকল্প।

চল্লিশের দশকের চলমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ বাংলার তথা বিশ্বের চিত্রশিল্পীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধের দামামা, নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীগুলোর বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবমুখীনতার তরঙ্গ বাংলার শিল্পবিকাশকে গতিশীল করে তুলেছিল। ভারতের স্বাধিকার আন্দোলন, মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে মন্বন্তর, বিশ্বের উপনিবেশিত অপরাপর অঞ্চলগুলোতে অস্থিরতা প্রভৃতি ঘটনার রেশ আমাদের জাতীয় জীবন ও শিল্পকলাকে তীব্রভাবে আলোড়িত করেছিল। চল্লিশ-পরবর্তী শিল্পীদের কাজেও এই রেশ অপ্রতিহত গতিতে বিকশিত হয়েছে। তখনকার প্রতিবাদের ধারা এবং এসবেরই অভিব্যক্তি দশক ছাপিয়েও ক্রিয়াশীল থেকেছে। বলা বাহুল্য, বাংলায় প্রাচ্য ধারার চিত্রচর্চা 'বেঙ্গল স্কুল' বা এ ধরনের কোনো কাঠামোকে অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করেনি। বরং বাংলার চিত্রকলায় এক আন্তর্জাতিক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের চিত্রকলায়ও তা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

বাংলাদেশের পাশ্চাত্য ধারার শিল্পসাধকদের মধ্যে যাঁরা সফল ও স্বতঃস্ফূর্ত, তাঁরাও স্বাদেশিকতা ও আধুনিকতার লক্ষণসমূহকে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। নির্বস্তুক ও বিমূর্ত রীতির ইউরোপীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী শিল্পান্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েও আমাদের জাতীয় জীবনের শিল্পভাষ্য সৃজনে তাঁরা প্রকৃত মনন ও মেধার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। স্বদেশি আন্দোলন ও স্বাধিকার, বিভাগোত্তর উপমহাদেশের নানা চড়াই-উতরাই, গতিশীল অর্থনৈতিক অভিঘাতের দরুন ক্রমপরিবর্তনশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং গোষ্ঠী ও ব্যক্তির অবস্থানকে তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্মে তুলে ধরেছেন। এই ধারাতেও, অর্থাৎ আমরা যাকে বাংলাদেশের চিত্রকলায় পাশ্চাত্য ধারা বলে অভিহিত করে থাকি, সেখানে অবধারিতভাবে প্রথম প্রজন্মের শিল্পী হিসেবে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস এম সুলতান, সফিউদ্দীন আহমেদ, হামিদুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, দেবদাস চক্রবর্তী, মোহাম্মদ কিবরিয়া প্রমুখ আলোচিত হয়ে থাকেন যথাক্রমে তাঁরা তাঁদের চিত্রশিল্পে রিয়ালিজম, কিউবিজম, যা পরাবাস্তববাদী ধারা, বিমূর্ত ধারা, জ্যামিতিনির্ভর ও রেনেসাঁ ধারার উপাদানের উপস্থিতির দরুন।

বাংলাদেশের চিত্রকলায় প্রাচ্য ধারার প্রভাব

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন বা কামরুল হাসান যদিও খুব কমই প্রাচ্য ঘরানার চিত্রাদর্শে প্রভাবিত হয়ে ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কাজগুলো সন্দেহাতীতভাবে গুরুত্ববাহী।

শিল্পী জয়নুল আবেদিন দেশভাগের পরে চলে এসেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলে এবং ভারতশিল্পের নবজাগৃতিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিজস্ব সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার তাগিদ থেকে তিনি বাংলার মানুষ, প্রকৃতি-পরিবেশ, জেলে, মজুর, নৌকা, মাঝি, সাঁওতাল-কন্যা, বেদেনী, গ্রামের বধূ, সমাজে অবহেলিত নিম্নবর্গের চাষি ও প্রান্তিক জনজীবনের ছবি সেই পর্যায়ে এঁকেছিলেন। (নিসার হোসেন ২০০৭ : ২০৩) তিনি ছবির রূপ, রস, অনুভব অতি সহজেই সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন বলে একটি জাতি ও তার আত্মগরিমা, অনুপ্রেরণা, এর ঐতিহ্য, লোককলা-লোকসংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে শিল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। (নিসার হোসেন ২০১৬ : ২০৯) শিল্পীসত্তার পাশাপাশি তাঁর সাংগঠনিক

শক্তিমত্তাও যথোচিত মাত্রায় ছিল বলেই লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অন্তর দিয়ে তিনি লোকশিল্পের সমঝদারি করে গেছেন। সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি সারা জীবন ব্যাপৃত থেকেছেন লোক-উৎসের সংগ্রহে। লোকজীবন সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের প্রমাণ তাঁর এই সকল প্রচেষ্টা। কলকাতার আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য ধারার শিল্পশিক্ষা নিলেও রেখা ও রঙে ১৯৪২-৪৩ সালে তাঁর আঁকা দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় তিনি নতুন রূপ, নতুন ছন্দের যোজনা ঘটিয়েছিলেন বলিষ্ঠ রেখার টানে, যা পরবর্তী সময়ে সোমনাথ হোরের ছবি ও ভাস্কর্যে প্রতিবাদের উদ্ভাসন ঘটায়। পঞ্চাশের দশকে ইউরোপ সফরের পর তাঁর মনোযোগ অধিকহারে বাংলার লোককলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই সচেতনতা থেকে তিনি নতুন উদ্যমে নতুন নতুন ছবি আঁকার প্রেরণা লাভ করেন, যেখানে স্থান করে নেয় নকশিপিঠা, নকশিকাঁথা, ঋতুবৈচিত্র্য এবং লোকজীবনের অপরাপর দিকগুলো।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে প্রাচ্য ধারায় ভারতীয় শিল্পশৈলীকে পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তাঁরই প্রিয় শিষ্য তৎকালীন কলকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ মুকুল চন্দ্র দে জয়নুল আবেদিনকে প্রাচ্যকলা বিভাগে অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন। জয়নুল আবেদিন নিজে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেন, মুকুল দে তাঁকে প্রাচ্য শিল্পে অধ্যয়নেরই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মারাত্মক দুর্বলতা ছিল ইউরোপীয় চিত্রাদর্শের প্রতি। ছোটবেলা থেকেই নিসর্গের ছবি তিনি এঁকেছেন এবং তাঁর রীতিও ছিল তাঁর নিজস্ব। তা ছিল বিস্তৃত ইউরোপীয় একাডেমিক পদ্ধতির। প্রকৃতিকে সেভাবেই প্রতিফলিত করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। স্টাইলাইজড ওরিয়েন্টাল রীতিতে তিনি খুব তৃপ্তি পেতেন না। (নজরুল ইসলাম ১৯৯৪ : ১০৩, ১০৪)

দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মূলত ইউরোপীয় একাডেমিক রীতিতেই কাজ করে গেছেন। ১৯৩২-১৯৩৮ পর্যন্ত তিনি পাশ্চাত্য রীতির প্রভাবেই কাজ করেন। তখনো বেঙ্গল স্কুলের ক্ষীয়মান প্রভাব কার্যকর। কলকাতা আর্ট স্কুল কেন্দ্রিক শিল্পচিন্তায় একাডেমিক বাস্তববাদই মূলধারা হিসেবে ছিল অস্তিত্বশীল। সংগত কারণেই জয়নুলের মানস কাঠামোতে সাদৃশ্যমূলক বাস্তবানুগতার প্রতি পক্ষপাত জোরালোভাবে রয়ে গিয়েছিল। এর পেছনের কারণটি মূলত প্রশিক্ষণজনিত। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন এর অন্তঃসারশূন্যতা। আবার বিকল্প হিসেবে সায় ছিল না বেঙ্গল স্কুলের আলংকারিক রেখা বা সাহিত্যগন্ধী বিষয়বস্তুর প্রতিও। লোকঐতিহ্যকে আশ্রয় করে যামিনী রায়ের যে ফর্মুলাবদ্ধ শৈলী তারও প্রতি তাঁর কোনো টান ছিল না। যেহেতু তিনি ইউরোপীয় রীতির রেখায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত, তাই প্রচলিত সেই রীতির প্রতি সায় না থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণসূত্রে প্রাপ্ত সেই দক্ষতাকে তিনি তাঁর 'চিহ্ন' হিসেবে গ্রহণ করেন। (আবুল মনসুর ২০০৭ : ২৭)

দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার পরে ১৯৫১ সালে জয়নুলের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি *সাঁওতাল দম্পতি*, *সাঁওতাল রমণীদ্বয়*, *বিদ্রোহী*, *মই দেওয়া*, *অপেক্ষা* প্রভৃতি আর পরবর্তী সময়ে আঁকা নিসর্গচিত্র, মানুষজন প্রভৃতিতে শিল্পাচার্যের তুলি আগেকার দুর্ভিক্ষ পর্যায়ের ছবিগুলোর মতো কর্কশ নয়। বরং কোমলতা, পেলবতা ও প্রবহমানতা নিয়ে সেগুলো অস্তিত্বশীল হয়ে আছে এবং সেগুলো অধিকমাত্রায় প্রাচ্যধর্মী। সেই সঙ্গে নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলীর আভাসও এতে অনুভূত হয়ে থাকে। আর এ সমস্ত ছবিতে সরলীকৃত বিষয় ও মেদহীন পটভূমির প্রয়োগ পটচিত্রের ঐতিহ্যকেই মনে করিয়ে দেয়। মোদ্দা কথা, জয়নুল আবেদিন নানা পর্বে নানা রকমের ছবিই এঁকেছেন। তাঁর চিত্রকর্মের পর্ব-বিভাজনকে বুঝতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সমকালীন সমাজবাস্তবতার দিকে। তিনি সময়কেই তুলে ধরেছেন নানা সময়ে। (আবুল মনসুর ২০১৩ : ৪৩)

সাঁওতালদের সহজ-সরল জীবনকে প্রতিফলিত করে এমন কালো, মোটা, সরল, আদুরে আর ছন্দময় রেখাসমূহ প্রাচ্য ভাবধারা-প্রসূত। তবে জয়নুলের হাতে পড়ে সেগুলো স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়েছে বিশেষভাবেই। দুর্ভিক্ষের চিত্রমালায় রেখাগুলো হয়েছে ক্ষিপ্র, কর্কশ, অমসৃণ। সামাজিক অস্থিরতা,

মানুষের আর্তনাদ, অমানবিকতার হাহাকারকে তিনি ভাষা দিতে পেরেছেন বৈশিষ্ট্যযুক্ত রেখা তথা শৈলীর সন্নিবেশে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর তাঁর কাজে বেশিমাত্রায় এসেছে প্রাচ্যধর্মিতা। তখন লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটান। প্রতীকী প্রাত্যহিক গ্রামবাংলার সাধারণ ছবি তিনি এই আঙ্গিকে জলরং ও গোয়াশে আঁকেন। এ পর্যায়ে তাঁর জলরং হালকা, অনুজ্জ্বল। তুলির টান, কম্পোজিশন বা স্পেস ব্যবহারে এ ক্ষেত্রে তাঁকে অনেক বেশি প্রাচ্যধর্মী মনে হয়। সাধারণত তাঁর কাজ বিষয় বা আধেয়কে লক্ষ রেখে আধারকে রূপদান করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনঘনিষ্ঠ ধারার সম্মিলনে তাঁর শিল্পমানস ঋদ্ধ। (মতলুব আলী ১৯৮৭ : ১৯)

*সাঁওতাল দম্পতি*তে রেখাসমূহ গতিশীল স্ট্রোকের মতো হলেও সেগুলো প্রাচ্য ধারার নয় এবং বিষয় দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও কিছুমাত্রায় পাশ্চাত্য ভাবধারাকে গ্রহণ করেছে। ফিগারের ছন্দিল দেহভঙ্গি, চলার ভঙ্গিতে প্রাণবন্ততা, রঙের ব্যবহার প্রাচ্য ধারার ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ চিত্রটি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ধারাকেই সংমিশ্রিত করে। *সাঁওতাল মেয়ে*তে প্রাচ্য ধারার শিল্পবৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন স্পষ্ট। আটপৌরে সাদা শাড়ির পরিহিতিতে, বাতাসে দোলায়মান কৃষ্ণচূড়ার আভাসে ছন্দ ও গতিময় কালো মোটা রেখার সাবলীল টানে প্রাচ্য ধারার চিত্রবৈশিষ্ট্য লক্ষ্যযোগ্য। *স্নানরতা* চিত্রের গ্রামীণ আবহ, প্রকৃতি ও নারীকে প্রাচ্য ধারায় চিত্রিত করা হয়েছে।

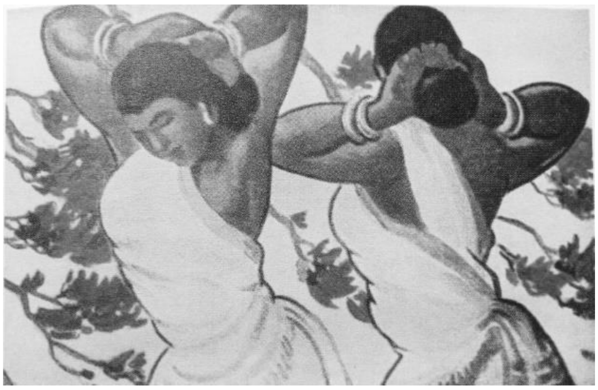

জয়নুল আবেদিন, *সাঁওতাল মেয়ে*, তেলরং

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মতোই একজন প্রকৃত শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান। তিনি বাংলার লোককলার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন ব্রতচারী আন্দোলনের পুরোধা গুরুসদয় দত্তের সংস্পর্শে এসে। ব্রতচারী আন্দোলনের অংশ হিসেবে পটচিত্রের অনুশীলন, জয়নুল আবেদিনের কাজের প্রভাব, যামিনী রায়ের চিত্রকর্মের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি কারণ তাঁকে লোককলার প্রতি আকৃষ্ট করে। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে তাঁর অঙ্কিত নারীদেহ পুতুলের ন্যায় ভরাট, দীর্ঘ গ্রীবা, চোখ-নাকের লৌকিক আদল এবং পটজুড়ে নকশাধর্মী দ্বিমাত্রিকতা স্থান পায়। *তিনকন্যা*, *গুণটানা* এ ধরনের কাজ। তখন তাঁর বিষয় হিসেবে আসে মা ও শিশু, নানা ভঙ্গিমায় নারী, নৈমিত্তিক গৃহকর্ম, পশুপাখির সাহচর্যে মানুষ ইত্যাদি। (আবুল মনসুর ২০০৭ : ২৯)

বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ আঙ্গিক হলো কামরুল হাসানের চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এর সপক্ষে প্রাচ্য ধারায় অঙ্কিত তাঁর কয়েকটি চিত্রের ব্যাপারে আলোচনা করা যায়। *উঁকি*-তে ফিগারের এই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা প্রাচ্য ধারাকে ইঙ্গিত করে এবং রমণীর দৃষ্টিপাত দর্শকের দৃষ্টিকে যেভাবে উন্মুখ করে তোলে,

তা-ও প্রাচ্যচিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। *স্তন্যদান*-এ দৃশ্যের উপস্থাপন হিসেবে প্রাচ্য ঘরানাকেই তা মনে করিয়ে দেয়। *সুসজ্জিতা*তে মুঘল চিত্ররীতির ছাপ বিদ্যমান। *তিনকন্যা* ছবিটিও প্রাচ্যের নন্দনতত্ত্বকে প্রতিভাত করে।

কামরুল হাসান, *উঁকি*, গোয়াশ, ১৯৬৭

আধার ও আধেয় দুই দিক থেকেই সুলতান বিউপনিবেশিত ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট শিল্পে। আধেয়ের দিক থেকে তিনি অন্বেষণ করেছেন নিজস্ব সত্তার আবার আধার হিসেবে সৃষ্টিশীল রূপান্তরে মনোযোগী হয়েছিলেন উপনিবেশপূর্ব অঙ্কনরীতির। তিনি দেশীয় অঙ্কনরীতিতে ফিরে গিয়েই আত্মতুষ্টি লাভ করেননি, ক্রমোন্নতি ঘটিয়েছেন সেই রীতিটির। তিনি পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে পুরনো ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রাচীন পটচিত্রে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল, একে তিনি অপ্রয়োজনীয়ও মনে করতেন। (সৈয়দ নিজার ২০১৭ : ১০২)

সুলতানের চিত্রিত পুরুষ ফিগারগুলো অনেকটা পাশ্চাত্য ধারার বলে অনেকে মনে করলেও নারী ফিগারগুলোতে কালীঘাটের পটচিত্রের রেখা ও শৈলীগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে দেখা যায়, সুলতানের চিত্রে বা রচনাশৈলীতে প্রাচ্যরীতির একটি বিশিষ্ট ধারা, অজন্তার দেয়ালচিত্রের সাদৃশ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অজন্তার দেয়ালচিত্রে যেভাবে পরিবেশ বা পরিপ্রেক্ষিত থেকে মানুষকে অথবা মানুষ থেকে মানুষকে আলাদা করে উপস্থাপনের কোনো প্রয়াস নেই, সুলতানের চিত্রকর্মেও এমনটি ঘটেছে। দেখা যায়, তাঁর চিত্রিত মানুষজন পরস্পরের সঙ্গে লেগে আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই লোকজন কখনো শুয়ে বা কখনো হেলে আছে; যে রকমটি অজন্তাতে দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক উপস্থাপনের অনুপ্রেরণা সুলতান পেয়েছিলেন অজন্তার গুহাচিত্র থেকে। তাঁর অঙ্কিত মানুষ কখনোই বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা হিসেবে ক্যানভাসে অবস্থান করে না। *গণহত্যা* শিরোনামের ছবিটির পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনা করা যেতে পারে যেখানে জ্যামিতিক কোনো পরিপ্রেক্ষিতকে এখানে গ্রহণ করা হয়নি। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর চিত্রকর্মে হ্যাভেলীয় ভারতীয় শিল্পদর্শন উপস্থিত। (সৈয়দ নিজার ২০১৭ : ১০৩, ১০৪)

সুলতানের ছবিগুলো ছিল প্রাণোচ্ছলতার এক নিরাবরণ দীপ্র প্রকাশ। তিনি ছবি এঁকেছেন বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের। মানুষ যেখানে বলিষ্ঠ, নগ্ন, হিংস্র। তিনি রোমান্টিক হয়েও ছিলেন বাস্তবের স্তবে ধ্যানমগ্ন শিল্পী, জীবনশিল্পীর যথোচিত মর্যাদায় বিভূষিত কঠোর পুরুষ। ছবির বিষয়বস্তুতে তাঁর এই মনস্তাত্ত্বিক ধারার প্রকাশ লক্ষণীয়। ছলচাতুরীর বাইরের এক আপাত বর্বরতার সুরে অবিরাম চিত্রময়তা তিনি উপহার দিয়ে গেছেন বাংলার প্রাচ্য ধারার শিল্পপরিমণ্ডলে। (সন্তোষ গুপ্ত ২০১২ : ৬৩)

দেশীয় উপাদান-উপকরণের মাধ্যমেই সুলতান ছবি আঁকার জন্য রং তৈরি করতেন। এ-ও তাঁর এক বিশিষ্টতা। *নবান্ন* চিত্রটিতে দেশীয় মোটিভ বিদ্যমান এবং রেখার প্রয়োগ লক্ষণীয়। দেশীয় মোটিভে আঁকা *মাছ কাটা* চিত্রটিতে দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজে কর্মরত তিনটি ফিগার উপস্থিত। দেশজ মোটিভে আঁকা *ধান ভানা* চিত্রটিও দেশজ সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। সুলতানের অন্য অনেক ছবির মতোই, শুধু বিষয়ে নয়, শৈলীতেও।

এস এম সুলতান, *নবান্ন*, তেলরং, ১৯৭৬

শিল্পী আব্দুস সাত্তারের নাম বাংলাদেশে প্রাচ্য ধারার চিত্রকলার চর্চা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উচ্চারণীয়। বাংলাদেশের পরম্পরাগত শিল্পকে তিনি গর্বের সঙ্গে প্রকাশ করেন। চারুকলার প্রাচ্য ধারার এক ছাত্রের সুবাদে তিনি এই ধারায় প্রবেশ করেন। পরে খ্যাতিমান আব্দুর রহমান চুঘতাইয়ের মাস্টারপিস কাজের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। ফলে তিনি আরও বেশিমাত্রায় প্রাচ্য ধারার চিত্রচর্চার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং চুঘতাইয়ের রেখার প্রভাবে তিনি রেখার চর্চা করা শুরু করেন। তিনি প্রাচ্য ধারায় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর সকল কাজে সেই ধারার প্রভাবকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। বিষয়ভিত্তিক, বিশেষ করে ফিগারেটিভ কাজে এই ধারার প্রভাব স্পষ্ট। প্রতীকধর্মী ও বিষয়মুক্ত কাজগুলোতে বরং পাশ্চাত্য আমেজ আংশিকভাবে দৃষ্টিগোচর। বিষয়, ফর্ম, রং, কম্পোজিশন বা অন্য সকল ক্ষেত্রেই তিনি কোনো না কোনোভাবে প্রাচ্য ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে সদা তৎপর থেকেছেন। শিল্পী আব্দুস সাত্তারের কাজে ওয়াশ পদ্ধতি এবং প্রাচ্য ধারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রাচ্যরীতির বৈশিষ্ট্য ছন্দোবদ্ধ রেখা, হালকা বর্ণবিন্যাসের প্রবণতা ইত্যাদি তাঁর কাজে জোরালোভাবে উপস্থিতি ব্যক্ত করে। প্রায়ই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির দুই সংমিশ্রণও তাঁর শিল্পে সহাবস্থান করে থাকে। তাঁর *উপজাতীয় মেয়েতে* আব্দুর রহমান চুঘতাইয়ের রেখা ও কারুকাজের প্রভাব লক্ষণীয়।

শিল্পী নাসরীন বেগম বাংলাদেশের সমকালীন প্রাচ্য চিত্রকলার জগতে অন্যতম একজন শিল্পী। তাঁর *দোতারা*, *রাধাকৃষ্ণ*, *প্রতিকৃতি*, *সুকুমারী*, *দুঃখ*, *কম্পোজিশন* ইত্যাদি প্রথম দিককার কাজে মুঘল

চিত্রকলা থেকে বেঙ্গল স্কুল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভারতীয় চিত্ররচনার বিভিন্ন ধারার কিছু কিছু উপাদান আত্তীকৃত হয়েছে। *সুকুমারী*তে বিষয় প্রাচ্যগন্ধী বলেই নয়, উপস্থাপনেও প্রাচ্য ধারার প্রভাব দুর্নিরীক্ষ নয়।

বাংলাদেশের চিত্রকলায় পাশ্চাত্য প্রভাব

১৯৪৭-এ দেশভাগের পর পাকিস্তানে শিল্পীদের আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দেয়। শাসকশ্রেণির ইসলামী মূল্যবোধ আর পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের জাতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার টানাপড়েনের মাঝে পড়ে অনেক শিল্পীই সৃজনশীলতা, আন্তর্জাতিকতার নামে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন বৃহত্তর বাঙালি জনমানস ও জনসমাজ থেকে। গুটিকয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের দেশের পঞ্চাশের দশকের প্রায় সকলেই এই দ্বন্দ্বকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। ফলশ্রুতিতে তাঁরা গুটিয়ে গিয়েছিলেন আপন অন্তর্জগতে। বহু আধুনিক শিল্পী যেভাবে পাশ্চাত্যমুখীন হয়েছিলেন স্বাদেশিকতাকে বর্জন করে তাঁদেরই মতো এঁরাও হারিয়ে গেছেন সিংহভাগই। যদিও এই বিচ্ছিন্নতা পাশ্চাত্যের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক, কিন্তু এই করতে গিয়ে অনেকে ঝুঁকে পড়েছিলেন দৃষ্টিনন্দন কিউবিজমের চোরাবালিতে, যেখান থেকে তাঁদের আর উত্তরণ ঘটেনি। তাঁরা তাঁদের শিল্পের মালমশলা আহরণ করতে লেগে গিয়েছিলেন পশ্চিম থেকে। বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের সামাজিক পূর্বসূত্র অনুধাবন না করেই অনেকে সেখানেও ভিড়ে গিয়েছিলেন। ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। পাশ্চাত্য ধারার শিল্পের চর্বিত-চর্বণ করে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর শক্তিমত্তাহীন যাঁদের অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন দেশজ উপাদানের মাধ্যমে রীতির পুনর্বিবেচনা, তাঁদের কাজগুলোও শিল্প নামধেয় হয়ে উঠতে পারেনি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় শিল্পীগণের সামনে সুযোগ আসে বিভিন্ন দেশে বৃত্তি নিয়ে চিত্রকলা বিষয়ে অধ্যয়নের। তাঁরা অনেকেই আমেরিকায় গিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। নিউ ইয়র্ককেন্দ্রিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত একদল শিল্পীর মাধ্যমে বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের চর্চা দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের সেই সব শিল্পী প্রভাবিত হন। পঞ্চাশের দশকে মার্কিনদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় ধারা ছিল এই বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ। তার সঙ্গে অবস্থান করছিল নানা আধা বিমূর্ত শৈলী। বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের সূচনা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতাজনিত মানসিক বিপর্যয় ও মানুষের অযৌক্তিকতা থেকে। সেখানে স্থান করে নিয়েছিল সেই মানসিক বিপর্যয়ের একধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। চিত্রপটে নজিরবিহীন ইমেজের অটোম্যাটিজম, যা পরাবাস্তববাদী ধারার কাজ, সেগুলোও তখন ভালোমাত্রায় শিল্পসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল। সচেতন মনের অবস্থাকে বাদ দিয়ে বরং অবচেতনের অন্বেষাই ছিল এই ধারার প্রবণতা। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী দালি, আর্নস্ট, ম্যাসন প্রমুখ আমেরিকায় অভিবাসিত হলে ইউরোপীয় শিল্পীদের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের উল্লেখিত নতুন চিন্তাচেতনার সংযোগ ঘটে। এই ধারার শিল্পীদের কাজের সঙ্গে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পীদের তখন পরিচয় ঘটে এবং তাঁরা সেখান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কোনো নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব ও অঙ্কিত বস্তুপুঞ্জের নির্দিষ্ট আদল সেখানে বর্জিত হয়। বাংলার অভিবাসিত শিল্পীগণ এবং বিদেশফেরত শিল্পীগণ তখন কিউবিজম ও পরাবাস্তববাদের ধারায় শিল্পশৈলীর নিরীক্ষায় মগ্ন হন।

বিলেতফেরত হামিদুর রহমান ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর স্পর্ধিত, জ্যামিতিনির্ভর নৈরাজ্যের কম্পোজিশনগুলোতে লোকরঞ্জন ও সংস্কারমুখীনতা তীব্র ছিল। ইতালিফেরত আমিনুল ইসলামের বিদেশি মেজাজ দ্রুতই দেশীয় মীমাংসার পথ ধরেছিল। মুর্তজা বশীর ছিলেন আরেকজন ইতালিফেরত, যাঁর নিরীক্ষা চলছিল দেশীয় পাত্র-পাত্রীকে বিদেশি নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে উপস্থাপনের প্রয়াস থেকে। কলকাতা প্রত্যাগত, পরে জাপানফেরত মোহাম্মদ কিবরিয়া বিমূর্ত

ধারায় আন্তর্জাতিকতাবাদী কাজ করলেও মেজাজে বাঙালি রয়ে গিয়েছিলেন। ফরাসিদেশ থেকে ফিরে রশীদ চৌধুরী চেষ্টা করেছিলেন রূপকথার মেজাজে অবচেতনার স্বপ্নাবেশকে ধারণ করতে। আর দেবদাস চক্রবর্তী শৈশব স্মৃতিকে তুলে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন মূর্ত-বিমূর্ত রূপের আভাসে।

এভাবেই পূর্ব পাকিস্তান আমলে আরও অনেক প্রতিভাবান শিল্পী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তবে তাঁদের নিরীক্ষা সীমিত ছিল প্রধানত মাধ্যম ও ভাষ্যনির্মাণের মধ্যে। উল্লেখ্য, বিশ্বনাগরিকতার জোর তাগিদ সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে বাঙালিয়ানার অনেক ব্যাপারের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল। তবে বাঙালির স্বভাবসিদ্ধ হাসি-তামাশার বদলে সেখানে আত্মানুসন্ধানের এক গম্ভীর ভাব বজায় ছিল এবং এই ভাবমগ্নতা তাঁদের মধ্যে সাধারণ বাঙালির আটপৌরে জীবনকে অনস্তিত্বশীল করে তুলেছিল। তাঁরা ছিলেন বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পী। উপনিবেশোত্তর বাংলাদেশের উদীয়মান এই শিল্পীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রথমবারের মতো পাশ্চাত্য শিল্পের নানা অনুষঙ্গের মেলবন্ধন ঘটে। তাঁদের সুযোগ ঘটে প্রচুর বইপত্র পাঠ, চিত্রকর্মগুলোর মূল বা অনুলিপি দর্শন, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, পাশ্চাত্য শিল্পবেত্তাদের সঙ্গে সংশ্রবের। তখন অনেক শিল্পী উজ্জীবিত হয়েছিলেন বামপন্থী রাজনীতির দ্বারা; কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পীদের কাজের শেষের দিকে শ্রেণিসংগ্রামের প্রেরণাজাত শিল্পসৃষ্টির রেশ থাকেনি। তাঁরা বরং আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প অভিব্যক্তির অনুরাগী ছিলেন, যদিও প্রথম দিকে অন্যায়-অসংগতির বিরুদ্ধে দ্রোহ ও অধিকারচেতনায় ও অন্ত্যজ মানুষের অধিকার রক্ষায় তাঁদের শিল্পীসত্তা উদ্দীপিত ছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে এবং এর পূর্বাপর সময়ে কয়েকজন শক্তিমান শিল্পীর উদয় ঘটে, যাঁরা পাশ্চাত্য ধাঁচে অসামান্য সফলতা পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদ ইউরোপ থেকে, মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপান থেকে, রফিকুন নবী গ্রিস থেকে, মনিরুল ইসলাম স্পেন থেকে শিল্পকলার ভাষা রপ্ত করেছেন এবং তাঁরা যথেষ্ট সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশের চিত্রকর্মকে প্রভাবিত করেছেন। তাঁদের শিল্পভুবন সাফল্যে পূর্ণ এবং একনিষ্ঠতায় আপ্লুত। বাংলাদেশের চিত্রকলায় পাশ্চাত্য প্রভাব প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান প্রমুখের আলোচনা শুধু তাঁদের দেশজ ধারার শিল্পকর্মের নির্মাণে পাশ্চাত্য উপাদান-উপকরণ, শৈলীর বা আঙ্গিকের আংশিক অবদানের ও ব্যবহারের কারণে আলোচ্য হয়েছে।

জয়নুল আবেদিন মানুষ ও প্রকৃতিতে মুগ্ধ। তাঁর মানুষ ও প্রকৃতি শিল্পী পল সেজানের শিল্পের মতোই প্রতিনিধিত্বশীল। কামরুল হাসানের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য, তিনি আবহমানতা নয়, প্রবহমানতার পথের পথিক। (সন্তোষ গুপ্ত ২০১২ : ৩৭)

জয়নুল আবেদিন বিমূর্ত ধারায় কিছু চিত্রকর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিমূর্ত ধারার চিত্রশিল্পের একজন সমঝদার। ইউরোপ-আমেরিকাফেরত তরুণ শিল্পীরা কিউবিস্ট ও অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের প্রতি দুর্বল ছিলেন এবং তাঁরা ওই ধারার প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ যত্ন করেন। জয়নুল আবেদিন তাঁদের নিরুৎসাহিত করেননি। বরং সেই সব শিল্পীর কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত চারুকলা ইনস্টিটিউটে। তাঁদের তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং নানাভাবে প্রণোদনাও প্রদান করেছিলেন। উল্লেখ্য, পাক-ভারতের তিনিই প্রথম চিত্রকর, যিনি বিমূর্ত চিত্রকলার টেকনিকের সঙ্গে স্থানীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। নারীদেহের গড়ন, কাঠামো, অনুপাত ও অবয়বের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের বাস্তবানুগ সম্পর্ক সৃষ্টি, দেহের নতোন্নত অংশকে নির্ণয়ে চড়া আলোর বিপরীতে সৃষ্ট কৃষ্ণাভাকে হেয়ালিপূর্ণ মোটা রেখায় রেখে দেওয়া ইত্যাদি প্রবণতা জয়নুলের পাশ্চাত্য একাডেমিক জ্ঞানকে প্রকাশ করে। কিছু ছবিতে জ্যামিতিক বিন্যাস ও রঙের শীতল এবং উষ্ণতাকে কাজে লাগিয়েছেন

সচেতনভাবে। এসব পাশ্চাত্যের বিমূর্ত ধারার প্রতি শিল্পাচার্যের আগ্রহকে প্রমাণ করে থাকে। তবে এই আগ্রহ তাঁকে অন্ধ কোনো অনুকরণকারীতে পরিণত করেনি। (নিসার হোসেন ২০০৭ : ২৮১)

শিল্পী কামরুল হাসান জয়নুল আবেদিনের মতোই কলকাতা আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য ধারায় শিল্পের শিক্ষা নিয়েছিলেন। যাহোক, কামরুল হাসানও অন্যান্য বড় চিত্রশিল্পীর মতোই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন তাঁর অনেক সৃষ্টিকর্মেই। তিনি এক্সপ্রেশনিস্ট, রিয়ালিস্ট চিত্রকর্মের দ্বারা ছিলেন প্রভাবিত এবং তাঁর প্রচুর কাজে কিউবিস্ট ঘরানার কোনো কোনো উপাদানের সতেজ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পিকাসোর কিউবিস্ট রীতি আর হেনরি মাতিসের বর্ণচ্ছটা তাঁকে মুগ্ধ করলেও তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন আপন শিল্পভাষা। লোকচরিত্রের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে না গিয়ে পাশ্চাত্যের প্রাগ্রসর ধারার শিল্প প্রকরণের সঙ্গে মিলে তাঁর চিত্রকর্মগুলো পেয়েছে নতুন মাত্রা ও ব্যঞ্জনা।

শিল্পী এস এম সুলতান ইউরোপের রেনেসাঁ পর্বের চিত্রশিল্পী মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর ক্যানভাসগুলোও মহাকাব্যিক। মানবদেহ অঙ্কনে তাঁর ওপর অগুস্ত রোদ্যাঁ (দ্য থিংকার), মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর সিস্টাইন চ্যাপেলে অঙ্কিত জোহাভার এবং প্রাচ্য ঘরানার কালীঘাটের পটের প্রভাব পড়েছিল। (নজরুল ইসলাম ২০০৯ : ১৩৪)

তবে পটচিত্রের আবহ ও অজন্তা-ইলোরার প্রভাব সুলতানের নারী চরিত্রাঙ্কনে দৃশ্যমান। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, তাঁর ছবিতে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, দ্য ভিঞ্চির প্রভাব থাকলেও তাঁর কাজের উদ্দেশ্য ও থিম আলাদা রকমের। বিষয় নির্বাচনে আবহমান বাংলার সাধারণ মানুষকে বেছে নিলেও তাঁর কাজের শৈলী লোকজ নয়; বরং রেনেসাঁ পর্বের। (শাওন আকন্দ ২০০৭ : ৩১৪)

কিছু কিছু বিমূর্ত, আংশিক বিমূর্ত ও ভ্যান গঘের ইম্প্রেশনিস্ট ধারার ছবি সুলতান পঞ্চাশের দশকে এঁকেছিলেন বলে জানা যায়। ভ্যান গঘের *পটেটো ইটার্স*-এর কথা প্রায়ই তিনি উল্লেখ করতেন। পল সেজান, ক্লদ মনের কাজেরও তিনি প্রশংসা করতেন। বাংলাদেশ বা ভারতের কোনো আধুনিক শিল্পীর প্রভাব সুলতানের কাজে পড়েনি এবং সুলতানের প্রভাবও উত্তরকালের কোনো শিল্পীর ওপর পড়েছে বলে জানা যায় না। সুলতানের চিত্রকলা পৃথিবীর সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করে থাকে। *প্রথম বৃক্ষরোপণ*, *চর দখল*, *ক্ষেত দখল*, *গাঁতায় কৃষক*, *নিসর্গ*-২, *মাছ ধরা*-৩ ইত্যাদি ছবির সবই শৈলীর দিক থেকে ইউরোপীয় রেনেসাঁ পর্বকে, না হয় ইম্প্রেশনিজমকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিল্পী সফিউদ্দীন আহমেদ ইউরোপ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশে ছাপচিত্রের শিল্পগুরু। তিনি ইম্প্রেশনিস্ট ধারার উত্তরসূরি শিল্পী। তিনি পছন্দ করেন এচিং, এনগ্রেভিং, ড্রাই পয়েন্ট, সফটগ্রাউন্ড, অ্যাকুয়াটিন্ট মাধ্যমে কাজ করতে। জ্যামিতিক ফিগারকে ভেঙে তিনি তৈরি করেন রঙের প্রক্ষেপণে ও বিন্যাসে ঋদ্ধ তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ১৯৮৮ সালে শিল্পগুরু সফিউদ্দীন আহমেদ ১৯৭১ সালের স্মৃতি নিয়ে আঁকেন *একাত্তরের স্মৃতি*। এনগ্রেভিং বা তাম্রতক্ষণ মাধ্যমে সৃষ্ট এ শিল্পকর্মে তিনি তুলে আনেন আমাদের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বররূপে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধের সময়কে। চোখ আর চোখের জলের বিচিত্র ফর্মে তিনি ভয়বিহ্বল, চাপা, সন্ত্রস্ত এক পরিস্থিতিকে উপস্থিত করেন। এই সৃষ্টিকর্মের রয়েছে দুটি আলাদা ভাষ্য। প্রথমটিতে রয়েছে ঘরের ভেতর থেকে জানালা দিয়ে বাইরের কোনো এক অস্বাভাবিক পরিবেশের বা ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত। দৃষ্টিতে আতঙ্ক, স্তব্ধতা। শঙ্কিত চোখ থেকে ঝরে পড়ছে অশ্রুবিন্দু। কিন্তু এতে তৃপ্ত না হয়ে শিল্পী আরও একটি ভাষ্যের জন্ম দেন ধাতব পাত্রে, যেখানে রেখার বৈচিত্র্যে, চোখ ও অশ্রুবিন্দুর সংখ্যায় তা প্রথমটিকে অতিক্রম করেছে। এখানে আলোর একটি রেখাও রয়েছে, যা বিষাদাচ্ছন্ন, ভয়ার্ত চাহনির বিপরীতে

আশার সঞ্চার করেছে। কালো, দমবন্ধ রাত্রির অবসানের ইঙ্গিতে এর তাৎপর্যও গভীর। (সৈয়দ আজিজুল হক ২০১৩ : ৬৩)

সফিউদ্দীন আহমেদ, *বন্যা*, তেলরং, ১৯৮৮

শিল্পী আমিনুল ইসলাম জীবনের সমগ্রতাকে শিল্পের বিষয়ীভূত করেছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর পরিবেশ সচেতনতা তাঁকে আন্তর্জাতিকতাবোধের পাশাপাশি স্থানিক বাস্তবতাকে চিত্রকর্মে তুলে আনতে উৎসাহ দিয়েছে এবং তিনি বড় বিষয়কে গ্রাহ্য করতে গিয়ে কখনো ক্ষুদ্রতর ব্যাপারকে এড়িয়ে যাননি। প্রত্যহের প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছেন যখনই প্রয়োজন মনে করেছেন। (সন্তোষ গুপ্ত ২০১২ : ৮৩)

ইউরোপে শিক্ষালাভের পর লিরিক্যাল কিউবিজমের প্রতি বিশেষ আকর্ষণবোধ করেন আমিনুল ইসলাম। তাই তাঁর কাজে ঋজু গড়ন ও গতিময় রেখা পরস্পরিত হয়ে আছে। তা ছাড়া এই নিরীক্ষাপ্রবণ শিল্পী জটিল মানব অস্তিত্ব ও দুঃসময়ের বিশ্লেষণের জন্য কোলাজ ও স্টেইন্ড গ্লাস মাধ্যমে নান্দনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। (মইনুদ্দীন খালেদ ২০১৯ : ২৫০)

আমিনুল ইসলাম বিমূর্ত, সম-বিমূর্ত, নির্বস্তুক রীতির চিত্রকলায় কেবলই গড়ন, আকার, আকর্ষণীয় রূপবন্ধ তৈরি করেননি; বর্ণবিন্যাসের চমৎকারিতা বা জ্যামিতিকতার চর্চায় পর্যবসিত হয়নি তাঁর চিত্রকলা। তাঁর চিত্রকর্মে পাওয়া যায় জীবনবোধের ও শিল্পবোধের গভীরতর ছাপ। বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানানসই উপযুক্ত মাধ্যম বেছে নেওয়ার প্রতি তাঁর সতর্কতার অন্ত ছিল না। তিনি প্রতিনিয়ত ভাঙা-গড়ার নানামুখী নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও বিমূর্ততাকে দীর্ঘ সময় আঁকড়ে ছিলেন। ষাটের দশক থেকেই তাঁর ঝোঁক বিমূর্তায়নের প্রতি নিবিষ্ট হয়েছিল। কিউবিজম দ্বারা যেমন এককালে প্রভাবিত হয়েছিলেন, আরেকবার ফর্মালিস্ট ধারার দিকেও অগ্রসর হয়েছিলেন। ড্রয়িং থেকে পেইন্টিং বা উল্টোটাও করেছেন পর্ব থেকে পর্বান্তরে। তিনি মূলত বাংলাদেশে আধুনিক প্রধানত পাশ্চাত্য আধুনিকতার শিল্পসাধনার একজন পথিকৃৎ হিসেবে স্মরণীয়।

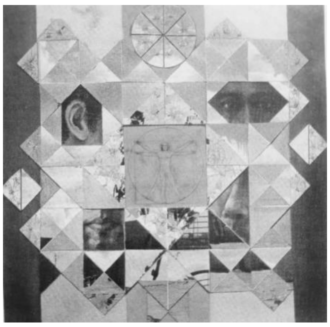

আমিনুল ইসলাম, *আত্ম-প্রতিকৃতি অন্বেষায়*, তলরং এবং আয়না কোলাজ, ১৯৮২

আমিনুল ইসলামের সমসাময়িক আরেকজন শিল্পী মুর্তজা বশীর। তিনি ফ্লোরেন্সে চিত্রকলার উচ্চতর শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সেখানে থাকাকালীন সেই শহরের জনজীবন, রাস্তাঘাট, প্রাসাদ, জিপসিদের খেলা দেখানো, অ্যাকর্ডিয়ান বাদক, মা-মেয়ের বাজার করা ও সাধারণ মানুষের ছবি আঁকেন। *মুভিমেন্টো প্রিমর্ডিও* নামে শিল্প-আন্দোলন গড়ে তোলারও চেষ্টা করেন ইতালীয় চিত্রকর রাপিসার্দি ও ভাস্কর ম্যাডোনিয়ার সঙ্গে মিলে। ফ্লোরেন্সের রেনেসাঁর ঐতিহ্য তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর *দেয়াল* সিরিজের কাজগুলো নন-ফিগারেটিভ ও বিমূর্ত। এটি ছাড়াও এপিটাফ সিরিজেও তিনি নির্বস্তুক চিত্রমালা এঁকেছেন। বিমূর্ত বাস্তবতা নামের একটি শিল্প-ধারার জনক এবং এর তিনি পরিপোষণ করতেন। তাঁর অঙ্কিত নারী ফিগারগুলো মোটেই ভারতীয় চিত্র-ঐতিহ্যের অনুগামী নয়। ফিগারেটিভ কাজে তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। প্রাক-রেনেসাঁর শিল্পী যেমন জত্তো, দুচ্চো, সিমাব্যু, ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকোর অঙ্কনশৈলীর দ্বারা ঋণী ও প্রভাবিত ছিলেন।

মুর্তজা বশীর, *গার্ল ইনফ্রন্ট অফ মিরর*, তেলরং, ১৯৫৯

শিল্পী মুর্তজা বশীরের ওপর ইতালিতে অবস্থানকালে সেখানকার শিল্পী মদিগ্লিয়ানির প্রভাব তীব্রভাবেই পড়েছিল। ইতালীয় রেনেসাঁর প্রাণচাঞ্চল্যকে তিনি স্বদেশের প্রাণচাঞ্চল্যের সঙ্গে মিলিয়েছেন। (সন্তোষ গুপ্ত ২০১২ : ৮৪)

পঞ্চাশের দশকের শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিবর্তিত হয়েছেন মুর্তজা বশীর। শিল্পী আমিনুল ইসলামের মতো এ শিল্পীও চিত্রচর্চার শুরু থেকেই রিপ্রেজেন্টেশনাল চিত্ররীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ইউরোপে শিল্পশিক্ষা লাভের পর বর্ণিল মোজাইক মোটিফ যোজিত হয়ে ছবিতে সংহত করেছেন ফর্মের প্রাধান্য। তারপর ফিগার ছেড়ে শিল্পী যখন একক মোটিফে অন্তরিত করলেন, সৃজনের আবেগ তাতেও গুরুত্ব পেলো ফর্মের শুদ্ধতা। *এপিটাফ* সিরিজ তাঁর বিমূর্ত পর্বের সবচেয়ে সংবেদী সৃষ্টি। (মইনুদ্দীন খালেদ ২০১৯ : ২৫০)

দেবদাস চক্রবর্তীর শিল্পকর্ম বাস্তবতা ও বিমূর্ততার সীমান্তে অবস্থান করে। স্মৃতিতে অপসৃত মূর্তির আভাসে তাঁর সৃষ্টিসমূহ বিমূর্ততা লাভ করেছে। (সন্তোষ গুপ্ত ২০১২ : ৭৭, ৭৮)

হাসান হাফিজুর রহমানের 'আধুনিক কবি ও কবিতা', সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী'তে করা প্রচ্ছদচিত্রের মতো আধুনিকতা ও বিমূর্ততার মিশেলে দেবদাস চক্রবর্তী নান্দনিক কিছু প্রচ্ছদেরও কাজ করেছেন। বিমূর্ত রীতিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধের উপাদানগুলোকে ক্যানভাসে চিত্রিত করেন। মূর্ত, বিমূর্ত ও

আধা বিমূর্ত চিত্রকলার মাধ্যমে তিনি আধুনিক বাংলাদেশের চিত্রধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর *বৃষ্টি* সিরিজের চিত্রমালা তাঁর আঁকা বিমূর্ত চিত্রকলার সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন। বৃষ্টির নানা রূপ তিনি তুলে আনেন তাঁর এই চিত্রমালায়; বৃষ্টিপাতের মতোই তাঁর ক্যানভাসের ফর্ম ও রঙের আচরণ। বর্ষা ও বৃষ্টি, শ্রাবণের অঝোর ধারা, শরতের ঝিরঝিরে বৃষ্টিকে তিনি ক্যানভাসের উপরিতল থেকে ফর্মের মাধ্যমে নিচে নিয়ে আসেন। বিমূর্ততায় স্থিত হলেও দেবদাস চক্রবর্তী বিষয়বস্তুকে বিস্মৃত হন না।

দেবদাস চক্রবর্তী, *রেইন*, তেলরং, ১৯৯৪

মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপান থেকে তিনি ছাপচিত্র ও চিত্রকলার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। কারিগরি কুশলতায় তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তিনি জাপানে তাকেশি হায়াকিক ও হিদেয়া হাগিওয়ার কাজে যথাক্রমে তেলরং ও কাঠখোদাইয়ের শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং এভাবে মধ্যপর্যায় অতিক্রান্ত করে তিনি তাঁর শিল্পসাধনার দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে সমকালীন পৃথিবীর নানা বিখ্যাত শিল্পীর কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং জাপান বাসকালীন বৌদ্ধ ও জেন দর্শনের দ্বারা, জাপানের নগর-পরিকল্পনা ও নিসর্গের জ্যামিতিক ছন্দের দ্বারা প্রভাবিত হন। আন্তর্জাতিক শিল্পান্দোলনের কিছু প্রধান স্রোতের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচিতি ঘটে। মার্ক রথকো, উইলিয়াম ডি কুনিং, আন্তনি ত্যাপেজ, পিয়েরে সুলাজ প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বিমূর্ত ধারার পাশ্চাত্য চিত্রকর্মের সঙ্গে আপন মগ্নযাত্রার সংশ্লেষণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিমূর্ত অভিব্যক্তির মধ্যে তিনি তাঁর সমান্তরাল শিল্পশৈলী লক্ষ করেন। তিনি মনে করেন, শিল্প অবচেতনের ব্যাপার। যদিও শিল্পকে চিত্রভিত্তিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কিন্তু তা শিল্পের গোঁড়ার কথা নয়।

আমিনুল ইসলাম ও মোহাম্মদ কিবরিয়া বাংলাদেশের বিমূর্ত চিত্রকলার আভাঁ গার্দ শিল্পী। আমিনুল ইসলাম সারা জীবন নিরীক্ষাধর্মী কাজ করে গেলেও মোহাম্মদ কিবরিয়া বিমূর্ততাকেই সারা জীবন তাঁর কাজের উপায় হিসেবে জারি রেখেছিলেন। কিবরিয়ার ছবিতে স্পেসের প্রকাশ শক্তিশালীভাবে অবস্থান করে এবং তাঁর সব ছবিতেই ফোকাল পয়েন্ট থাকে। শুরুতে তাঁর ছবিতে ভারতীয় ঘরানায় তেল ও জলরঙের ব্যবহার করতেন। তুলনামূলকভাবে তেলরঙের অধিক ব্যবহারে

চিত্রতলে গভীরতা আনয়নের এবং রঙের যথাযথ ব্যবহারের ও টেক্সচারের মাধ্যমে চিত্রতলকে পাশ্চাত্য ধাঁচে সমৃদ্ধকরণের জন্য তিনি যে পদ্ধতির আশ্রয় নেন, যা ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, ক্রমে তিনি সেদিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। নিসর্গ ও আলোর প্রতি ইম্প্রেশনিস্টদের অনুরাগ তাঁর মধ্যে সঞ্চরমাণ ছিল। মোহাম্মদ কিবরিয়া ইম্প্রেশনিজমের দীক্ষাতেই নিরীক্ষায় মগ্ন ছিলেন। ক্রমে তিনি কিউবিজম ও এক্সপ্রেশনিজমের পথ ধরে বিমূর্ততার দিকে যাত্রা করেন। (এস এম সাইফুল ইসলাম ২০২০ : www.prothomalo.com)

কিবরিয়া তাঁর প্রদর্শনীতে স্থাপিত কোনো চিত্রকর্মেরই কোনো শিরোনাম দেননি। নৈর্ব্যক্তিক কল্পনাময় এক অচিন্ত্যবোধের প্রাণসঞ্চার করেছেন তিনি। নিঃসঙ্গতা ও নীরবতার অবয়বকে তিনি তুলে ধরেন বিমূর্ত এক্সপ্রেশনিজম বা সহজ কথায় বিমূর্ত চিত্রকলার মাধ্যমে। এই বিমূর্তায়নে সবশেষ অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় ফর্ম ও স্পেসের খেলা। তাঁর *কবরস্থান* বলে পরিচিত চিত্রটিতে পরাবাস্তব বিষাদের দ্যোতনা লক্ষ করা যায়। নিঃসঙ্গতা, নীরবতার অবয়বকে বিমূর্ত চিত্রকলায় তুলে আনার কঠিন সাধনায় তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন।

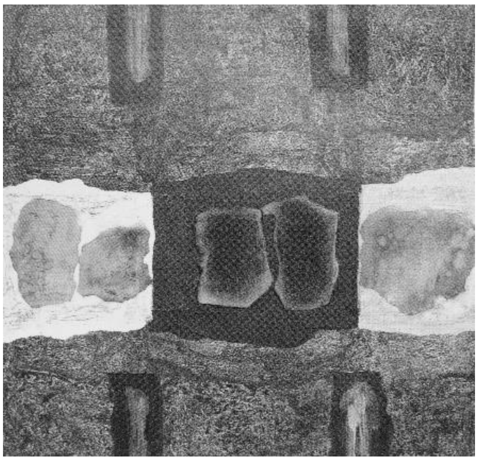

মোহাম্মদ কিবরিয়া, *ছাই*, তেলরং ও কোলাজ, ১৯৭৮

জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস এম সুলতান প্রমুখের থেকে দূরবর্তী এক ধারায় সফিউদ্দীন ও কিবরিয়া অবস্থান নিয়েছিলেন। কিবরিয়ার কাজ ছিল জাপানি ওয়াশ টেকনিকে। ক্রমাগত এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে তিনি নিজের উত্তরণ ঘটিয়েছেন। রিয়ালিস্টিক আর্ট থেকে ক্রমে ফর্মে এবং আরও পরে তিনি চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিক চিত্রকর্মে অভিনিবেশ করেছেন। ফর্ম আর রেখা ক্রমশ মিশে গেছে স্বপ্ন আর কল্পনায়। এক্সপ্রেশনিজম থেকে তাঁর উত্তরণ হয়েছে ইম্প্রেশনিজমে। দ্বিমাত্রিকতা থেকে তাঁর অভিযাত্রা চলে গেছে ত্রিমাত্রিকতার দিকে। নিরেট রং ছাপিয়ে তিনি ক্রমে স্বচ্ছতায় ও ধূসরতার দিকে যাত্রা করেছেন।

সফিউদ্দীন আহমেদ আর মোহাম্মদ কিবরিয়া বাংলাদেশের শিল্পীদের আধুনিক মনন উপহার দিয়েছেন। মোহাম্মদ কিবরিয়াকে অনেকেই অনুসরণ করেছেন, বাংলাদেশের চিত্রকলার ধারাকে তিনি পাল্টে দিতে পেরেছিলেন। শিল্পী মনিরুল ইসলাম বাংলাদেশের সর্বাধিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী। ছাপচিত্রের দক্ষতা ও করণকৌশল তাঁকে এই মাধ্যমে বিশ্বের একজন প্রথম সারির শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে। *ড্যান্সিং ইন দ্য ফরেস্ট* তাঁর একটি জলরঙের চিত্রকর্ম।

মনিরুল ইসলাম, *ভেনেশিয়ান ফিয়েস্তা*, অ্যাক্রিলিক অন পেপার, ২০০৫

শিল্পী রশীদ চৌধুরী পঞ্চাশের দশকের সমসাময়িক শিল্পীদের মাঝে শিল্পভাবনা প্রকাশ, মাধ্যমের নিরীক্ষা ও উপস্থাপনায় তাঁর সতীর্থদের চেয়ে ভিন্ন ছিলেন। প্রথম দিকে ইম্প্রেশনিস্ট ও এক্সপ্রেশনিস্ট ধারার কাজের প্রভাব তাঁর মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। মার্ক শাগালের কাজের প্রেরণার অনুষঙ্গসমূহ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সমকালীন আধুনিকতার আঙ্গিকে শৈল্পিক উপস্থাপনে তিনি আমাদের দেশের বয়নশিল্পের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেন এবং ট্যাপেস্ট্রিকে সে ক্ষেত্রে বেছে নেন। কিন্তু তিনি লোকজ বাংলার প্রথাগত কারুশিল্পের পথে যাননি। বরং রূপকথা, লোককথা প্রভৃতি উৎস থেকে উপাদান-উপকরণ নিয়ে অন্তর্গত নির্যাসকে ধরতে চেয়েছেন। ইউরোপীয় কারিগরি দক্ষতাকেই তিনি একমাত্র উপজীব্য করেননি। ট্যাপেস্ট্রিতে মানুষ, বাড়িঘর, পশুপাখি, গাছপালা নিয়ে তাঁর লোকজ রূপকল্পনার প্রতিশ্রুতিশীল উপস্থাপনায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন তাঁকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার গতিপথ নির্মাণের কারিগর করে তুলেছে। চল্লিশের দশকের নব্যভারতীয় রীতির গতানুগতিকতা তাঁকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক চিত্রভাষায় তিনি দেশজ চেতনার অন্বেষণ করেছেন।

রশীদ চৌধুরীর কাজে মার্ক শাগালের জন্মদিন বিষয়ক (১৮৮৭) চিত্রকর্মের প্রভাব

শিল্পীজীবনের শুরুতে তিনি অবয়বধর্মী চিত্রকলায় দক্ষতার প্রমাণ দেন। তখনকার তাঁর কাজে কিউবিজম ও ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি মার্কিনদেশে থাকাকালীন প্রকাশবাদী ধারার সঙ্গে পরিচিত হন। বাংলাদেশে বিমূর্ত প্রকাশবাদী চিত্রকলার চর্চায় যাঁরা পথিকৃতের মর্যাদায় অভিষিক্ত, তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

কাজী আবদুল বাসেত মানবদেহের অঙ্কনে বাংলার লম্বা গলার পুতুলের ফর্মকে নানাভাবে নিজস্ব রূপায়ণে ভেঙেছেন। মধ্যবয়সে জয়নুল আবেদিনের কিউবিক ঘরানার লোকজ চিত্রকলার মতো করে কিছু চিত্রকর্ম সম্পাদন করলেও এ ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল অনেক মাত্রায়। তিনি জীবনভর মূর্ত-আধা বিমূর্ত প্রকাশভঙ্গির সাধনা করেছেন। আমেরিকায় গিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা শেষে ফিরে এসে তিনি যেভাবে

বাংলার প্রাকৃতিক অনুষঙ্গগুলোর টেক্সচারকে মোটা বর্ণলেপনের মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন, তা বাস্তববাদিতার বিশ্বাসযোগ্যতাকে অতিক্রম করে গেছে এবং হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ বিমূর্ত চিত্রকলা।

বিমূর্ত চিত্রকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর শিক্ষানবিশীকালে যদিও একাডেমিক বাস্তবানুগ চিত্ররচনার মধ্য দিয়েই গেছেন, ক্রমে তিনি নির্বস্তুকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিমূর্ততার প্রথম পর্যায়ে আসেন। সমকালীন শিল্পপ্রবাহে তাঁর কাজগুলো মূর্ততা-আধা বিমূর্ততার প্রাঞ্জল উপস্থাপনে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সার্থক সম্মেলনে স্বীকৃত হয়। তাঁর চিত্রকলা শৈলীতে বিদেশি হলেও বিষয়বস্তুতে দেশীয় নিসর্গ, প্রাণ-প্রকৃতি, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকেই নিয়েছেন। সোনালি, হলুদ, সনুজ, নীল ইত্যাদি রঙের কম্পোজিশনে ও স্পেসের ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্যের ধারায় গ্রামীণ আত্মাকে শিল্পে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর, *পেশেন্ট ওয়েট*, তেলরং, ২০০২

শিল্পী কালিদাস কর্মকার অনেকটাই পরাবাস্তববাদী ধারায় কাজ করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য ঢঙে তাঁর চিত্রসাধনা করলেও চিত্রের আত্মা প্রাচ্যের। তিনি অনায়াসে স্বপ্ন, বাস্তবতা এবং আপাত অসংগতিপূর্ণ, প্রায় সম্পর্কহীন বলে প্রতিভাত হয় এমন উপাদান ও প্রতীকগুলোকে তাঁর ক্যানভাসে নিয়ে আসেন। ক্লান্তির প্রকাশে তিনি শামুকের প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। আবার বিধ্বংসী রকেটের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন কপোতের আপাত বিপরীতার্থকতাকে। তাঁর আঁকা রাইফেলের নল থেকে বের হয়ে আসে তিনটি ফুল। তাঁর *স্বপ্ন* ও *পরিবেশ* সিরিজের চিত্রগুলো পরাবাস্তবতা ও প্রতীকের জগতের ছবি। সত্তরের দশকের পাললিক বাংলা শিল্পের রূপকার কালিদাস কর্মকারের বিমূর্ত চিত্রকলা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় রূপরেখাতেই উদ্ভাসিত।

শিল্পী কাজী গিয়াসউদ্দীন ক্যানভাসে ছবি আঁকতে গিয়ে প্রকৃতির জগতের সংগীতকে ধারণ করেন। তাঁর ছবিতে বিমূর্ত শিল্পকলার সাধারণ সূত্রগুলোকে নিজের ভাষা দিয়ে উন্মোচিত করেছেন। বিষয়ভিত্তিক বাস্তবতা বা কংক্রিট রূপ নয়, বরং তিনি তাঁর চিত্রপটকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, যেন দর্শকের ওপরেও সেটার উপলব্ধিগত বিনির্মাণের দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকে।

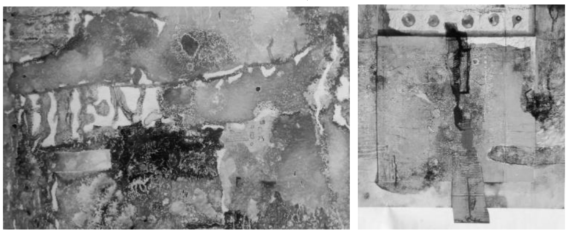

কাজী গিয়াসউদ্দীন, *উৎসবের শব্দ*, তেলরং, ২০১১. মোহাম্মদ ইউনুস, *রেস্টোরেশন অফ সিভিলাইজেশন*, মিশ্র মাধ্যম, ২০০৪

শিল্পী মোহাম্মদ ইউনুস নগর স্থাপত্যের ভগ্নরূপ ও অলিগলির কুশলী চিত্রায়ণের মাধ্যমে শিল্পজীবন শুরু করলেও পরে নির্বস্তুক উপস্থাপনের দিকে দৃষ্টি দেন। তবে এরই মধ্যে তিনি বাস্তব অনুষঙ্গসমূহকে তুলে ধরেন দক্ষতার সঙ্গে। প্রকৃতির নানা প্রতীক, বস্তু, ইমেজগুলো তাঁর চিত্রে স্থান করে নেয় টুকরো টুকরোভাবে। কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুকে ক্যানভাসে জুড়ে দিয়ে, তুলির চালনা ও বুনটের নির্মিতিতে, বর্ণবৈভবে আর রেখার আঁকিবুঁকির ঐকতানে তাঁর চিত্রতল সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। (আবুল মনসুর ২০০৭ : ৫১)

তিনি কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবন ও শিল্পকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি প্রকৃতি থেকে রং, রেখা নিয়ে আবেগ, অভিজ্ঞতাকে উপস্থিত করেছেন বিস্ময়কর বিমূর্ত চিত্রকর্মের মাধ্যমে। জ্যাকসন পোলক, উইলিয়াম ডি কুনিং, মার্ক রথকোর কাজের সঙ্গে তাঁর কাজের সাদৃশ্য আছে। শিল্পী মোহাম্মদ ইউনুসের শিল্পসৃজন একধরনের গবেষণা; নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্যে যাত্রা নয়, যাত্রাপথে অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের চেষ্টা। কালো, ছাই ও ধূসর রং তাঁর পছন্দের। তাঁর ছবি বিমূর্ত কবিতার মতোই। তাঁর বিমূর্ততার ভেতরে অবস্থান করে জীবনের এক রূপান্তরিত আভা। জাপানি চিত্রকলার আত্মিক উৎকর্ষের অনুরণন তাঁর চিত্রকর্মে ধরা পড়ে। বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকরদের মধ্যে বাংলাদেশে তাঁর নাম প্রথম সারিতে অবস্থান করে, যাঁদের চিত্রকলা নিজস্ব ভাষা ও বোধের নির্মাণ করতে পেরেছে। রং-রেখা-টেক্সচারের সমন্বিত আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় তাঁর চিত্রকলা বিশিষ্ট।

কনক চাঁপা চাকমা বাংলাদেশি জাতিগত সংখ্যালঘুদের জীবন আর নারীদের দৈনন্দিনতাকে উপজীব্য করে আধা বাস্তব, আধা বিমূর্তভাবে উপস্থাপন করে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ইম্প্রেশনিস্ট ধারার কাজের থেকেও প্রেরণা লাভ করেছেন। পাহাড়, পাহাড়ি মেয়েদের পিঠে বহন করা ঝুড়ি, পার্বত্য এলাকার বাড়িঘরকে তিনি আধুনিক ফর্মে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

বৈশ্বিকভাবে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডগুলোর যে প্রভাব যুদ্ধ, হানাহানি, সহিংসতা, বিদ্বেষভাবাপন্নতার কারণে শিশুদের মনস্তত্ত্বে পড়ছে, তাকেই ভাষা দেন শিল্পী মোহাম্মদ ইকবাল। তিনি চিত্রকর্মকে ভাষা হিসেবেই সংজ্ঞায়িত এবং ব্যবহার করেন।

উপসংহার

নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাদর্শ এককালে তরুণদের কৌতূহল জাগিয়েছিল। বেঙ্গল স্কুল তীব্র প্রভাব বিস্তার করে ছিল একসময়ে। আবার এককালে এসে আন্তর্জাতিকতাবাদী চিত্রাদর্শের কিউবিজম, বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ, পরাবাস্তবতার প্রলেপ পড়েছিল আমাদের চিত্রশিল্পের চর্চায়। বলা বাহুল্য, কোনো ধারাই লুপ্ত হয়ে যায়নি এবং কোনো ধারাই চিরকাল একাধিপত্য বজায় রাখতে পারে না। যাঁরা ছবিতে দেশীয় উপাদানের যোজনায় আস্থাশীল ছিলেন তাঁরা সাধারণত ঝুঁকেছেন লোকশিল্পের প্রতি। এ ক্ষেত্রে সকলেই সফলকাম হয়েছেন, তা বলা যায় না। শক্তিমান শিল্পীরা তাঁদের দক্ষতা ও নান্দনিকতার বলে দেশজ বিষয়গুলোকে সাফল্যমণ্ডিতভাবে শিল্পোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ করে তুলেছেন এবং যাঁরা পাশ্চাত্য ধারায় ছবি এঁকেছেন, তাঁদের অনেকেই দেশীয় প্রেক্ষিতে সফল, মানসম্পন্ন ও নন্দনতাত্ত্বিকভাবে শিল্প-পদবাচ্য শিল্পসৃষ্টিতে আপন আপন ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের মধ্যে যেমন, তেমনি বাংলাদেশের পাশ্চাত্য ধারার শিল্পসাধকদের মধ্যে যাঁরা সফল ও স্বতঃস্ফূর্ত, তাঁরাও স্বাদেশিকতা ও আধুনিকতার লক্ষণসমূহকে একটি বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। নির্বস্তুক ও বিমূর্ত রীতির ইউরোপীয় আন্তর্জাতিকতাবাদী শিল্পান্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েও আমাদের জাতীয় জীবনের শিল্পভাষ্য সৃজনে তাঁরা প্রকৃত মনন ও মেধার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। স্বদেশি আন্দোলন ও স্বাধিকার, বিভাগোত্তর উপমহাদেশের নানা চড়াই-উতরাই, গতিশীল অর্থনৈতিক অভিঘাতের দরুন

ক্রমপরিবর্তনশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং গোষ্ঠী ও ব্যক্তির অবস্থানকে তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্মে তুলে ধরেছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক আমলে বাংলাদেশে প্রাচ্য ধারার শিল্পচর্চার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে পাশ্চাত্য ধারার চিত্রকলার চর্চা। সমসাময়িক কালেও এই দুই ধারা বিচ্ছিন্নতা ও মিলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব চিত্রকলার সাগর সঙ্গমে বিলীয়মান হচ্ছে। প্রতিভাবান কয়েকজন শিল্পীর আবির্ভাবের ফলে বাংলাদেশের প্রাচ্য ঘরানা বা দেশজতার ধারার চিত্রকলা মাঝেমধ্যেই অসামান্য সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেছে; তবু এখনকার বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রধান প্রবণতা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত। বিষয়বস্তুতে যদিও দেশীয় রূপপরিগ্রহ করছে, কিছু কিছু দেশজ উপাদানকে গ্রহণ করছে, তবু সার্বিকভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের ভঙ্গিতে প্রবলভাবে পাশ্চাত্য প্রভাব কার্যকর রয়েছে। এমনকি একেই মূলধারা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

আবুল মনসুর (২০০৭) 'ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল', চারু ও কারু কলা, (লালা রুখ সেলিম সম্পা.)

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

(২০১৩), *জয়নুল আবেদিন : শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, বেঙ্গল পাবলিকেশন, ঢাকা।

এস এম সাইফুল ইসলাম (২০২০) 'কিবরিয়ার পারাপার বীরভূম থেকে ঢাকা', https://www.prothomalo.com/onnoalo/arts/ (Accessed 3 December 2023)

নজরুল ইসলাম (২০০৯) *সমকালীন শিল্প ও শিল্পী*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

(১৯৯৪) *জয়নুল স্মৃতি* ১ম খণ্ড, মতলুব আলী সম্পা., মানব প্রকাশন, ঢাকা।

নিসার হোসেন (২০০৭), 'জয়নুল আবেদিন', *চারু ও কারু কলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

(২০১৬) *জয়নুল শতবর্ষে*, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মইনুদ্দীন খালেদ (২০১৯) 'চারুকলাচর্চার সূচনাপর্ব ও পঞ্চাশের শিল্পীদের কাজ' (রাশেদ সুখন সম্পা.), *বাংলাদেশের চিত্রকলা : বিচিত্র বিন্যাস ইতিহাসের পাঠ*, নৈঋতা ক্যাফে, ঢাকা।

মতলুব আলী (১৯৮৭) *জয়নুলের কথা*, মানব প্রকাশন, ঢাকা।

শাওন আকন্দ (২০০৭), 'সমকালীন শিল্পকলায় প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা', *চারু ও কারু কলা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (লালারুখ সেলিম সম্পা.), ঢাকা।

সন্তোষ গুপ্ত (২০১২), *বাংলাদেশের চিত্রকলা শিল্পী ও শিল্প রূপ*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক (২০২৩), 'বিপুল প্রাণশক্তি ও শিল্পসামর্থ্যের পরিচয়বহ', রফিকুন নবীর অশীতিতম জন্মবার্ষিক : রেট্রোস্পেক্টিভ প্রদর্শনী।

সৈয়দ নিজার (২০১৭), *ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা*, চৈতন্য, সিলেট।

[Abstract : The Art of Bengal emerged, incorporating its oriental aptitude before the upheaval of the colonial period as well as the beginning of institutional pedagogy of art here in West Bengal. The application of the art style of Ajanta painting was not rare in the art practices of ancient and medieval

ages of Bengal. Along with the classical ones, the thriving art of Bengal was opulent, consisting of the diverse elements and styles of the rural as well as traditions of folk art. If the art of Muslim culture, especially from the Persian heritage, is considered as the oriental style along with the art style of the Far East, then it has been well observed that the art of Bengal, being part of the oriental nature for over the centuries, has emerged as the practice of collective effort, rather than the individualistic endeavors. During the British colonial reign, all these diverse traditions had been rejected by the name of British enlightenment in Bengal. But by the movement of the New Bengal School of Art and as the outcome of other nationalistic incidents, the oriental style revived in Bengal eventually, having different attitudes and modes. But simultaneously, a parallel stream of modernistic approaches relevant to the socioeconomic changes after the Second World War was also prevalent after the partition of 1947. All these shifts were influential to the growth of the painters of the first and second generations in Bangladesh, who developed the art scene as well as the aesthetic horizon of the East Pakistan period before the independence of our country. So, there were two prominent streams, oriental and western, responsible for the formation of the art aptitude of Bangladesh. These two vibrant streams, both assimilating with or disassociating from each other, emphatically influence and control the art endeavors of our contemporary artists.]